Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Abul Kashem Fazlul Haq
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.6
Pages	203-220
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর—আবদুল মওদুদ। প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৯। নওরোজ কিতাবিস্তান, বাঙলা বাজার, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ৫০২, দাম বারটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাঙলার সমাজ এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। প্রতিষ্ঠিত সামন্ত শাসক-শ্রেণী তখন ক্রমেই চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলছিল আর ধ্বংসোন্মুখ শাসক-শ্রেণীর প্রতিপক্ষ হিসেবে সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে জেগে উঠছিল এক বর্ধিষ্ণু মধ্য শ্রেণী—যার প্রধান অংশ ছিল বণিকেরা। সামন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও শাসন-পদ্ধতির চাপে নিষ্পিষ্ট বিপুল জনগণ তখন প্রতিষ্ঠিত শাসক-শ্রেণী এবং প্রচলিত সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি ক্রমেই হয়ে উঠছিল আস্থাহারা। সমাজের আইন-শৃংখলা, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি পড়ছিল ভেঙে। সমাজে সূচিত হয়েছিল কালান্তরের পূর্বাভাস। গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠন হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। কালান্তরের সংগঠনে ও সমাজের বিপ্লবী নেতৃত্বের ভুমিকা গ্রহণ করার কথা ছিল উদীয়মান মধ্য শ্রেণীর—যার প্রধান অংশ ছিল বণিকদের গোমস্তা ফড়িয়ারা। কিন্তু এই শ্রেণীর পক্ষে বাঙলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সমাজের পুনর্গঠনসাধন সম্ভব হয়নি বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে। বাঙলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই শ্রেণী বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সহযোগী একটি শ্রেণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিকাশ লাভ করে।

জনাব আবদুল মওদুদের 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর' পুস্তকটিতে ইংরেজ শাসকদের সহযোগী, এই শ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে লেখকের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান কিংবা তথ্যের একত্র সন্নিবেশ ঘটানো নয়। লেখকের উদ্দেশ্য, ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করা—অর্থাৎ অতীতকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত অগ্রগতির ইঙ্গিত দান করা। এই বিরাট আকৃতির পুস্তকে যদিও বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, মত নির্বিশেষে বহু লেখকের লেখা থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বহু পাদটীকা সম্বলিত রয়েছে, তবু এর মূল্যায়নে অগ্রসর হয়ে এসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে তথ্যের সত্যাসত্য লক্ষ্য করে বিশ্লষণের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হবে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক প্রাক্-বৃটিশ আমলের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। যেহেতু গ্রন্থের নাম 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর' এবং যেহেতু লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় এবং আরও বহু স্থানে বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেছেন—পাক-ভারত উপমহাদেশে পাশ্চাত্য জাতির পূর্বে ঠিক সেই শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, যা অধুনা মধ্যবিত্ত শ্রেণী রূপে চিহ্নিত হয়'—এবং যেহেতু লেখক ভূমিকায় আরোও উল্লেখ করেছেন—'অবশ্য মুসলিম শাসন আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপদান সমূহের অস্তিত্ব ছিল'—সে জন্যই লেখক যে-ভাবে গ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগ করেছেন, তাতে এই অধ্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্ব উপাদান সমূহ সম্পর্কেই আলোচনা থাকার কথা। অবশ্য আমাদের মতে এ গ্রন্থের অধ্যায়-পরিকল্পনা ভিন্নরূপ হতে পারত—গ্রন্থের আকৃতিও আরো অনেক ছোট হতে পারত। এবং প্রথম অধ্যায়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচয় প্রদানের প্রয়াস থাকতে পারত। কিন্তু এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কি দেখতে পাই? লেখক কি নিরাসক্ত, অনাচ্ছন্ন ও সত্যসন্ধ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন? এ অধ্যায়ের প্রথমাংশে লেখক পাক-ভারতে যে-সব নরগোষ্ঠী এসে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন, ..."এসব মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে

আর্য বা বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় বহিরাগত হয়েও এ দেশে স্থায়ী বসবাস করে দেশটিকে আপন করে ফেলেছে এবং এ দেশের মাটির সঙ্গে মিলে তণ্ডুলে মিশে গেছে। ......আর্যরা প্রাচীন যুগে, মুসলমানরা মধ্যযুগে ও ইংরেজরা বর্তমান যুগে আধিপত্য বিস্তার ও শাসনদণ্ড চালনা করলেও প্রথম দুটি সম্প্রদায়ই দেশের বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে পাক-ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত; অন্য সব মানবগোষ্ঠী হয় হিন্দু দেহে লীন হয়ে গেছে না হয় আপন গৃহবাসে ফিরে গেছে। ...এ উপমহাদেশের সুবৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু ও মুসলমান। এবং বিদেশী ইংরেজরা এ দেশের শাসনভার পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় বহুলাংশে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহের সমন্বয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাকী অংশে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে গেছে। আর এ বিভাগ ও দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে চূড়ান্ত ভাবে— শান্তি ও শৃংখলার, কল্যাণের ও মঙ্গলের শুভবুদ্ধির ভিত্তিমূলে। ... মুসলিম মুঘল বাদশাহীর অবসান পর্বে এ দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় হয়তো নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম-সংঘাতের পরিণতিতেও এ বিভাগ ও এ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের কল্যাণ পথ খুঁজে পেত, একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছতে সক্ষম হতো। কিন্তু তখন তা সম্ভব হয়নি। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়তে থাকে, তখন মুঘল উত্তরাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় এমন অবস্থা হয়ে যায়, যেন হিন্দু মারাঠা শক্তি এই লুটের মালে সিংহ ভাগই অধিকার করবে, এবং 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' প্রতিষ্ঠিত করবে, ভারতীয় কবির স্বপ্নাদর্শে 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' বেঁধে ফেলবে। কিন্তু এ দেশে মুসলিম-রাজ থেকে হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রয়াসটা ব্যর্থ হয়ে যায়, ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী ও পাক-ভারতীয় সম্মিলিত মুসলমান শক্তিসমূহের নিকট মারাঠা-শক্তির শোচনীয় পরাজয়ে। আর এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও আপোষ মীমাংসামূলে তখন প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অধিকার ও প্রতিষ্ঠা স্থাপনের সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি তৃতীয় পক্ষ শক্তিশালী ইংরেজদের

হস্তক্ষেপে ও অশুভ অভ্যুদয়ে।" —লেখকের এই বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের দুটো প্রশ্ন: এক, লেখক যে-গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর' তাতে উদ্ধৃত অংশে যে প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে তা আনার প্রয়োজন কি? দুই, লেখক এখানে যে মন্তব্য করেছেন তা কি সঠিক? লেখক যখন গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' তখন স্বাভাবিক ভাবে এটাই ধরে নেওয়ার কথা যে লেখক সমাজের শ্রেণী বিভাগ করেছেন বিত্তের ভিত্তিতে। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হয়েই আমরা দেখতে পাই সমাজের শ্রেণী বিভাগে লেখকের মানদণ্ড বিত্ত নয় — ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ ঘটনা যে শুধু গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়েই ঘটেছে তা-ই নয় — সারা গ্রন্থ জুড়েই ঘটেছে। এমন হওয়ার কারণ কি? গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে লেখকের কি কোন সুস্পষ্ট প্রেরণা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না? রচনায় হাত দিয়ে লেখক কি গোড়াতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন? না-কি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থের নামের কোন সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেননি লেখক? প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আর্থিক অবস্থার আলোচনায় অগ্রসর হয়ে গোড়াতেই লেখক বলে নিয়েছেন, "পাক-ভারতে অধ্যুষিত এই দুটি বৃহৎ জাতির—হিন্দু ও মুসলমান মানস-গঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভাব, পারস্পরিক সম্বন্ধ ও রাষ্ট্রিক যোগাযোগ বিশেষভাবে স্মরণ করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হতে পারে" — এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যদিও লেখক গ্রন্থের নামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন তবু তাঁর মনে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ আলোচনারই ধারণা ছিল। এ জন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পর প্রতিপক্ষ করে দাঁড় করিয়েছেন এবং স্বাজাত্য বুদ্ধি বশে মুসলমানদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন পক্ষপাতমূলক সহানুভূতি আর হিন্দুর প্রতি অকারণ বিরূপতা। লেখক যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছদ্মাবরণের আশ্রয় গ্রহণ না করে সোজাসুজি নিজের বক্তব্য বলার চেষ্টা

করতেন তা হলে হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে পারত বেশী। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন লেখকের মন্তব্যের সত্যাসত্য নিয়ে। "আর্য বা বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় বহিরাগত হয়েও এ দেশে স্থায়ী বসবাস করে এ দেশটিকে আপন করে ফেলেছে এবং এ দেশের মাটির সঙ্গে তিলে তণ্ডুলে মিশে গেছে।" — এ মন্তব্য কি সঠিক ? শ্রেণী-ভেদ কলুষিত হিন্দু সম্প্রদায়ে বহিরাগত আর্যেরা কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেনি ? বহিরাগত মুসলমানদের কি আজও সৈয়দ, খোরাসানী, ইস্পাহানী, গজনবী, কোরেশী প্রভৃতি নামের আড়ালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ও আশারাফি প্রমাণ করার চেষ্টা করে না ? আলোচনায় অগ্রসর হয়ে হিন্দু মাত্রকেই লেখক আর্য নামে চিহ্নিত করেছেন এবং মুসলিম মাত্রকেই ভেবেছেন বহিরাগত। পাকভারতের মুসলমানদের মধ্যে বহিরাগতের সংখ্যা যেমন চির-কালই নগণ্য, তেমনি হিন্দুর মধ্যে আর্যের সংখ্যাও নিতান্তই নগণ্য। গোটা দক্ষিণ ভারত, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজপুতনায় আর্যের সংখ্যা শতকরা দুই জনও ছিল কি-না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবোধ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক যুগে উদ্ভুত চেতনা। পাক-ভারতে এই চেতনার সূত্রপাত হয় বৃটিশ উপনিবেশ যুগে। অথচ লেখক সে চেতনা মধ্যযুগে আরোপ করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে অবশ্য চিরকালই স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ছিল—কিন্তু বৈষয়িক জীবনে এই চেতনা কখনও বৃটিশ-পূর্ব যুগের ভারতবর্ষে ছিল না।

ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অবশ্যই জাতীয়তাবোধ নয়। মধ্যযুগের শাসকদের প্রকৃত পক্ষে কোন দেশ-চেতনা বা জাতি-চেতনা ছিলনা। তাদের ছিল রাজ্য-চেতনা। সেজন্যই রাজত্ব রক্ষার ও রাজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে তারা স্বধর্মীকে শত্রু করতে এবং বিধর্মীকে মিত্র করতে কখনও কুণ্ঠিত হয়নি। গোয়া, দমন, দিউ, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চল যখন ইউরোপীয় বণিকেরা দখল করে নিয়েছিল তখন দেশীয় রাজন্যেরা স্বদেশপ্রাণতা বশে সেগুলো রক্ষা করার কিংবা সেগুলোকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেনি। বাঙলা দেশ দখল করার পর ইংরেজেরা প্রথম

স্বীকৃতি ও অভিনন্দন লাভ করলো দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট থেকে। মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় সম্রাটই প্রথম মীর কাসিমকে পরিত্যাগ করে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলালো। পলাশীর যুদ্ধের আগে ত দেশী রাজণ্যরা ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, আর্মেনীয় প্রভৃতিকে সৈন্য বিভাগে ও উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত করে স্বরাজ্যে স্বস্তি চেয়েছে। আসলে শাসক ও শাসিত দুটো আলাদা জাত। শাসন-নেতৃত্ব রক্ষার স্বার্থে শাসকেরা যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এসব কথা ভাবেননি বলেই লেখক মধ্যযুগেও আধুনিক সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাসের রূপরেখা অবলোকন করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে তুর্কী মুঘলেরা কখনও এদেশকে স্বদেশ বলে মনে করেননি, এযুগের প্রবাসী চাকুরীজীবিদের মতই তারা জীবিকা হিসেবে এদেশে রাজত্ব করতো ও রাজসরকারে কর্মচারী নিযুক্ত হত। এর প্রমাণ মেলে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মেজর মুনরোর সঙ্গে বাঙলার পদস্থ মুঘল কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের দলিলে। লেখকের মনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল বলেই পলাশীর যুদ্ধের জন্য তিনি বর্ণহিন্দুকে দায়ী করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে গিরিয়ার যুদ্ধকে যদি তিনি মিলিয়ে দেখতেন এবং সমাজের ভাঙ্গা গড়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা যদি তিনি লক্ষ্য করতেন তাহলে লেখকের সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভিন্ন হত। হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন অংশ সাম্প্রদায়িক চেতনা বশে তৎকালীন 'মুসলমানী-শাহী লুপ্ত করার হোতা ছিল'— এই বক্তব্যের সমর্থনে লেখক কোন ঐতিহাসিক তথ্য দেখাতে পারেননি। মুসলমান নবাবেরা সেযুগে ইসলামের ধ্বজাধারী হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের অধিকাংশই ছিলেন একান্ত ভোগবাদী ও অনাচারী। অপরদিকে হিন্দুসমাজের যে অংশ উচ্চাভিলাষী তার সদস্যরাও যে ধর্মপ্রাণ ছিলেন তারও কোন প্রমাণ নেই; বরং তারা যে নিতান্তই ঐহিক স্বার্থ-প্রণোদিত ছিলেন এবং নগদ বাণিজ্যিক স্বার্থ ও আপাত প্রাপ্তির পেছনে ধাওয়া করছিলেন তারই যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

ইসলাম কিংবা হিন্দুধর্মের অথবা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক চেতনার কোন ভূমিকা ছিলনা এতে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বহিরাগত মুসলমানেরা আজও পাক-ভারতে কোন স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টিতে কিংবা সনাতন সংস্কৃতি-প্রবাহে আত্মলীন হয়ে কোন অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। যদিও সুদীর্ঘকাল ধরে তারা এই উপমহাদেশে বসবাস করছে তবুও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ইঙ্গ-ভারতীয়দের চেয়ে অধিক কিছু নয়। অতীতে যেসব নরগোষ্ঠী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তারা পাক-ভারত উপমহাদেশের জনগণের সঙ্গে রাতারাতি 'এক দেহে লীন' হয়ে যায়নি—সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একদিন লীন হয়েছে। আর্যেরা ও বহিরাগত মুসলমানেরা যে নিজেদের আলাদা করে রাখার ব্যর্থ অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে তাও সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই একদিন বিলীন হয়ে যাবে। সে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা না ভেবে যদি বলা হয় তারা 'এ দেশের মাটির সঙ্গে তিলে তণ্ডুলে মিশে গেছে'—তা হলে সত্যের অপলাপ হয় মাত্র।

লেখকের মনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল বলেই ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত এ যুগের হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনৈতিক বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কালের সমাজ, জীবন ও মনকে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন এবং মধ্যযুগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অবলোকন করেছেন।

প্রাক্-বৃটিশ বাঙলার অর্থনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বণিক শ্রেণী কারিগর শ্রেণী ও ভূম্যধিকারী উচ্চ শ্রেণীর আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় প্রচুর তথ্যের সমাহার ঘটে থাকলেও কি উদ্দেশ্যে এই তথ্য সম্ভারের আয়োজন তা বোঝা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ কি ছিল, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ কতখানি প্রখর

ছিল, কোন্ প্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল, কোন্ শ্রেণী সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, কোন সামাজিক শক্তি অপস্রিয়মান ছিল এবং কোন্ শ্রেণী উজ্জীবনী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছিল—এসব বিষয় আলোচিত হয়নি সেখানে।

লেখক ইঙ্গিত করেছেন যে, রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস, বল্লভাচার্য প্রমুখ মনীষী যে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ইসলামের প্রভাবে না এলে তা তাঁরা করতেন না। আর মুসলমানরা এদেশে না থাকলে রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐক্যের বাণী প্রচারিত হত না। আমাদের প্রশ্ন হল, যদি ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার না ঘটত তাহলে কি ভারতীয় সমাজ, সামাজিক আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতি চিরকাল একই অবস্থায় থাকতো? কোন পরিবর্তন কি তাতে দেখা দিতনা? অবশ্যই দেখা দিত। সমাজের বাস্তব-ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন নৈপুণ্য কোথাও চিরকাল অনড় থাকেনা, আর সমাজের এই বাস্তব অবস্থাতে যখন পরিবর্তন ঘটে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম-সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে। ভারতীয় সমাজও অবশ্যই পরিবর্তনের এই চিরন্তন নিয়মের অধীন। সমাজে এই পরিবর্তন সাধিত হয় সমাজের অন্তঃস্থিত সম্ভাবনার ফলেই। পাক-ভারতের সমাজও অন্তঃস্থিত সম্ভাবনার ফলেই চিরকাল পরিবর্তিত হয়ে এসেছে এবং পরিবর্তনের এই সম্ভাবনা আজও তার অফুরন্ত। বাইরের শক্তি এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে, কিংবা সাময়িক কালের জন্য বিলম্বিত করতে, কিংবা বিকৃত করতে পারে মাত্র। ইসলাম একটি বহিরাগত শক্তি হিসেবে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ সমাজে ইসলামের যেটুকু প্রসার ঘটেছে তাতে ইসলাম এখানে কোন ভিন্ন দেশীয় রূপে অপরিবর্তিত থাকেনি, এ দেশের বিশেষ বাস্তব অবস্থায় ইসলাম এখানে নবরূপ লাভ করেছে। সামাজিক বিরোধ কি এক, সমাজ বিকাশের সব স্তরেই কেবল মাত্র ধর্মীয় পার্থক্যকে কেন্দ্র করেই

সাধিত হয়? অবশ্যই না। আমাদের দৃষ্টিতে সমাজে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাত হয় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বাস্তব স্বার্থকে কেন্দ্র করে। বৃটিশ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ইতিহাস লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে, এই বিরোধের মূলেও গোড়া থেকেই সক্রিয় ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাস্তব স্বার্থই। ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিকে আমরা যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বিষ বাষ্প দেখতে পাই তার পশ্চাতেও ক্রিয়াশীল ছিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাস্তব স্বার্থ। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্ম-নিষ্ঠাকে অনেকে এক করে দেখেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। "ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার বিচারের। সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সঙ্গে। অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তির নিজের আচরণ ও ধর্ম-বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশী। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশী। এ ছাড়া সত্যকার ধর্মনিষ্ঠা পরকালমুখী। পরকালই তার পুরস্কারের আশা। সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা ইহলোকে। ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচারণের প্রয়োজন নেই। অন্যের বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-আচরণকে ভিত্তি করে যে সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সেই সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই।" (সাম্প্রদায়িকতাঃ বদরুদ্দীন উমর) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ঘনীভূত হয়েছিল তার পশ্চাতেও ক্রিয়াশীল ছিল ধর্মীয় চেতনা নয় —এই আন্দোলনের নেতাদের ঐহিক স্বার্থচেতনা তথা সাম্প্রদায়িক মনোভাব। পাক-ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থের চেতনা ও পাকিস্তান আন্দোলন বিশ শতকের ঘটনা। এই চেতনার ও আন্দোলনের জনক ছিল মুসলমান

সমাজের উচ্চতর স্তরের চাকুরীকামী ইংরেজী শিক্ষিত অংশ। আরবী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান এবং হিন্দু-বিরল অঞ্চলের মুসলমানেরা এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামের অংশী ছিল না। তার প্রমাণ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রভাব ছিল না এবং সাধারণ ভাবে মৌলবী-মৌলানারা ছিলেন কংগ্রেসী এবং কৃষক-জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল দুর্লক্ষ্য। রাজনীতিবিদেরা বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যা-ই বলুন না কেন, পণ্ডিত জনের সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রথম যে একটি রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র ছিল তার প্রমাণ ক্রীপস্ মিশন প্রদত্ত গ্রুপিং মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছিল এবং দ্বিজাতিতত্ত্বে স্বয়ং জিন্নাহ্ সাহেবও দৃঢ় ছিলেন না। এর প্রমাণ, বাঙলা ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান ও শিখ নিয়ে অবিভক্ত রাষ্ট্র গঠনে তাঁর সম্মতি ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—এর কোনটাই বিপুল হিন্দু মুসলিম জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেনি, সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিল মাত্র। তবুও হিন্দু-মুসলিম জনগণ এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করেছিল স্বাধীনতা-রূপ-মাকাল ফলের আকর্ষণ বশে। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি যে এক কথা নয় এ কথা তখনও পাক-ভারত উপমহাদেশের জনগণ উপলব্ধি করতে পারেনি। সে উপলব্ধি এসেছে স্বাধীনতা অর্জনের পর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কংগ্রেসের নেতারা যে অখণ্ড ভারতের ও এক ভারতীয় জাতির শ্লোগান তুলেছিল তার কারণ এ নয় যে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ণবিশ্বাসকে মুছে দিয়ে হিন্দু ধর্মের সনাতন রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল—বরং তার কারণ এটাই যে অখণ্ড ভারতে তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ হতে পারত আরও অধিক পরিমাণে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা নিরূপণে অগ্রসর হয়ে লেখক বলেছেন, "সাধারণ কথা বার্তায় বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।" আমাদের মতে সাধারণ কথাবার্তায় বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমার্থক নয়। বুর্জোয়া বলতে বোঝায় আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী—যার সদস্যেরা সামাজিক

উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক এবং মজুরী শ্রমের নিয়োগ কর্তা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যবর্তী দোদুল্যমান যে শ্রেণী—যার সদস্যেরা কমবেশী সম্পত্তির ও নিরাপত্তার অধিকারী কিন্তু বুর্জোয়াদের মত সম্পূর্ণ শ্রমহীন জীবন যাপনে যারা সমর্থ নয়, যারা বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত হয় কিন্তু বুর্জোয়াদের আশ্রয়ে শ্রমিক শোষণের ভাগ পায় এবং জীবিকা অর্জনে যাদের কম-বেশী পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকতে হয়—তাই মাধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর সদস্যেরা স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে কখনও বুর্জোয়াদের সাথে আবার কখনও শ্রমিকদের সাথে সহযোগিতা করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে পরিণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণী হিসেবে এই শ্রেণী সমাজ রূপান্তরের কোন আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহন করতে পারে না। এই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের চরিত্রে অবশ্যই কম-বেশী পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ কথাবার্তায় মাঝারি বুর্জোয়া ক্ষুদে বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত শ্রেণীকে বলা হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উপনিবেশ আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের অবস্থা ভিন্নরূপ: এই সব দেশ উন্নততর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে কিংবা প্রত্যক্ষ প্রভাবে থাকার ফলে এগুলোতে যন্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে না। এ-সব দেশ উন্নততর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের এবং সে-সব দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার হয়ে থাকে। ফলে এ-সব দেশে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীর মত শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে না। এ সব রাষ্ট্রের জনগণ বৈদেশিক শক্তির অধীনে কিংবা প্রভাবে বাস করে, আর দেশের মধ্য থেকে এমন একটি শ্রেণী এ-সব দেশে গড়ে উঠে যারা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের বশংবদ হিসেবে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অন্বেষণ করে। পাক-ভারত উপমহাদেশেও ইংরেজ শাসন আমলে এই ধরণের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসকেরা এই শ্রেণীর গড়ে উঠার পেছনে ও এর মানস-গঠনে সচেতন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে অন্যতম

প্রধান প্রমাণ হচ্ছে লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অন্যতম প্রণেতা ও তৎকালীন India Gagette পত্রিকার সম্পাদক মেকলের সেই বিখ্যাত উক্তি; 'we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern ; a class at persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in morals and intellect'। বলা বাহুল্য, ইংরেজরা এ দেশে তাদের পদলেহী যে শ্রেণী গঠন করেছিল এবং যে শ্রেণী এ দেশে গড়ে উঠেছিল তার সবটার রূপরেখা নেই এই উক্তিতে; এতে রয়েছে মাত্র সে-শ্রেণীর শিক্ষিত অংশেরই রূপরেখা। ইংরেজ শাসকদের সহযোগী ও পরাধীন ভারতবর্ষের সুবিধাভোগী এই শ্রেণীকেই আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আরও অনেক লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে অভিহিত করলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে, উচ্চবিত্ত শ্রেণী কোন্‌টি। বর্তমান আলোচনায় এ প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে লেখক যে শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলেছেন, তার বিশ্লেষণই গ্রন্থটিতে লক্ষ্য করা যাক্‌।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্লেষণ লেখক কিভাবে করেছেন? গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, বৃথাই লেখক এই শ্রেণীর সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। কারণ নিজের নিরূপিত সংজ্ঞার আশ্রয়ে লেখকের আলোচনা অগ্রসর হয়নি—লেখক আলোচনা করছেন হিন্দু মুসলিম—এই দুই সম্প্রদায়ের কথা, এবং হিন্দু বলতে লেখক মনে করেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী অংশ আর মুসলমান বলতে লেখক মনে করেছেন মুসলমান সমাজের সুবিধাভোগী অংশ। দুই সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী অংশই বিদেশী শাসকদের পদলেহন করেছে ও দেশের আপামর জনগণকে শাসন ও শোষণ করার ব্যাপারে বিদেশী শাসকদের সাহায্য করেছে এবং নিজেরা স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। অথচ গ্রন্থকার কেবলমাত্র হিন্দুদের নিন্দা করেছেন বিদেশী শাসকদের পদলেহী

হিসেবে, আর মুসলমানদের প্রশংসা করেছেন নির্বিচারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আলোচনায় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে লেখক আলাদা করে রেখেছেন। ওহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন, ফকির বিদ্রোহ —প্রভৃতির আলোচনা করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে "এ কাণ্ডজ্ঞান তাদের জন্মালো, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে শ্বেত দ্বীপবাসীদের তাড়ানো যাবে না, নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের আযাদী লাভের চিন্তা করতে হবে। আর এ কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে বৈরী ভাবে না চলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে।" আলোচনার ধারায় লেখক দেখিয়েছেন, এভাবে মনোভাব পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের সহ-যোগিতায় এগিয়ে যায় এবং কংগ্রেসের পাল্টা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিম লীগের জন্ম দান করে। আমরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করি। ফকির আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন ও ফরাজী আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে যে-মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার আন্দোলনের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ও উনিশ শতকের মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পরকাল—ইহকাল নয়। ইহকালে বাস করে পরকালের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য যে-টুকু ঐহিক তুচ্ছতায় জড়িত হওয়া প্রয়োজন সে-টুকুই তাঁরা হয়েছিলেন; তাঁরা শাহাদৎ বরণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না পরকালের দিকে তাকিয়েই; দেশের জন্য জাতির জন্য কোন উন্নততর ও সুন্দরতর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে যাওয়ার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, তাঁদের আন্দোলন ছিল আপোষহীন রক্তক্ষয়ী, চূড়ান্ত আদর্শ-ভিত্তিক। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম রূপটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার ও ইসলামের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েই তাঁরা পরিচালিত হতেন। ইসলামকে তাঁরা অবলম্বন করতেন এক পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন,

জীবন-পদ্ধতি জীবন-সাধনা হিসেবে। সৈয়দ আহমদ, তিতুমীর, হাজী শরীয়াতুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলোর পাশাপাশি যদি আমরা মুসলিম লীগের আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখতে পাব ঐহিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই এসেছিল ইসলামের কথা; দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও আপোষ—আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মত কোন আপোষ-হীন পদ্ধতি তা কোন দিনই গ্রহণ করেনি; তৃতীয়ত, মুসলিম লীগের আন্দোলন কোন পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন, জীবন-পদ্ধতি ও জীবন-সাধনাকে অবলম্বন করেনি—পাশ্চাত্য আদর্শের আলোকে বৈষয়িক ও পার্থিব স্বার্থের অনুকূলে ইসলামের আধুনিকীকরণেরই পক্ষপাতি ছিল এ প্রতিষ্ঠান। আদর্শ অবলম্বনের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ছিল উদারতাবাদী। মুসলিম লীগ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য নয়—বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে দর কষাকষি করে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্যই। এই জন্যই মুসলিম লীগের আন্দোলন পূর্ববর্তী ঐ সব আন্দোলন থেকে গুণগতভাবে—চরিত্রগতভাবে পৃথক। এ দুটি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে দুটি পৃথক ঐতিহাসিক যুগের আন্দোলন। মুসলিম লীগ পূর্ব-বর্তী আন্দোলনগুলোর কোন স্বীকৃতি দেয়নি—মুসলিম লীগের দলিলপত্রে সে সব আন্দোলনের উল্লেখ নেই। এমনকি সে সব আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে পর্যন্ত মুসলিম লীগ গ্রহণ করেনি। মুসলিম লীগ যেমন ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে দরকষাকষি ও আপোষের দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য তেমনি, তারও আগে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসও স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে একই প্রকার সম্পর্কে গিয়ে হিন্দুদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য। আমাদের ধারণা কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ এই দুই প্রতিষ্ঠান যে শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেই শ্রেণী গোড়ার দিকে অবিভক্ত ছিল এবং

একই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে বিকাশের এক স্তরে এসে তা বিভক্ত হয় এবং কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের জন্ম হয়। স্বয়ং জিন্নাহ্ সাহেব পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবনের এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে—এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। ওহাবী প্রভৃতি আন্দোলন মুসলিম লীগের আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ার আন্দোলন এবং সে সব আন্দোলনের নেতৃত্বও ছিল অন্যধারার এক সামাজিক শক্তির হাতে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে লেখক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ দেখাতে চেয়েছেন তা এই সব আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আসেনি। কিন্তু লেখক দেখাতে চেষ্টা করেছেন, বিশ শতকের মুসলমান সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এ ধারা থেকেই। সামাজিক শ্রেণীবিরোধের বাস্তব ভিত্তি ও প্রকৃত রূপটির দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করে—হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক—এই ধরণের একটি পূর্ব-ধারণা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার ফলেই এমন হয়েছে।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লেখক তাঁর আলোচ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সামন্তবাদী বাঙালী সমাজের উপর উপনিবেশ যুগে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের প্রভাবে এখানে যে শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণী গড়ে উঠে তার সংস্কৃতিকে লেখক 'বাবু কালচার' বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে এই 'কালচার' এবং ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের শাসনের সুবিধার্থে 'বাবু শ্রেণীর' ও 'বাবু কালচারেরর' উদ্ভব ঘটিয়েছিল। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাটিকে লেখক আলাদা প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন এ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাটি অষ্টাদশ শতকের পুনরুজ্জীবনবাদী ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর আশ্রয়ে প্রসারিত হয়েছে— পাশ্চাত্য প্রভাব এর

উপর পড়েনি। লেখকের এই বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট ও কাল্পনিক। বলাবাহুল্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বাঙলার জাগরণের স্বরূপটি লেখক উপলব্ধি করতে পারেননি উগ্র সম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সে চেষ্টাও লেখক করেননি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যেসব বিতর্ক চলছে সেসব সম্পর্কেও লেখক আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ নিক্ষেপ করেছেন। লেখকের মতামতের সঙ্গে যাদের মতবিরোধ তাঁদেরকে লেখক 'গঙ্গাতীরস্থ বাবু কালচারের' উত্তরসূরী বলে অভিহিত করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা, লেখক তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মতামত পর্যবেক্ষণ করে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি। যাঁরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেন তাঁদের 'অন্তরের বিশ্বাস' নিয়ে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন 'সোজা পাকিস্তানী বলে নিজেকে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা কেন।' তিনি বুঝতে চেষ্টা করেননি যে প্রাকৃতিক কারণেই বাঙালী পরিচয় প্রদান অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ফলে বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধানকে পর্যন্ত লেখক অস্বীকার করেছেন। লেখক আদৌ চিন্তা করেননি যে চিরদিনই রাষ্ট্রসীমার হ্রাসবৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রের ভাঙ্গা গড়া আছে, কিন্তু ভৌগোলিক পটভূমিতে দেশগত পরিচয় চিরস্থায়ী।

পূর্ব-বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তাকে লেখক মনন-সংকট বলে অভিহিত করেছেন। এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন "এ যুগের পৃথিবীর চেহারাটা দিনদিন এমন পাল্টে যাচ্ছে যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্পায়ণনীতি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাত সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে সর্বগ্রাসীর মত। আর পৃথিবীর তাবৎ উন্নয়নকামী দেশগুলি, বিশেষত, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি পাশ্চাত্যজাতের সে প্রভাব বৃত্তে জড়িয়ে পড়ছে, কারণ পাশ্চাত্যজাতের প্রভাবের বাইরে আত্মরক্ষা করে চলার যোগ্যতা আজ

আর কোন জাতির নেই। নেই টিকে থাকার সামর্থ্য। পৃথিবীর এ পরিবেশে আমাদেরও টিকে থাকতে হবে এবং তার দরুণ অবশ্যম্ভাবীরূপে পাশ্চাত্য প্রভাবের মায়াজালে জড়িয়ে পড়তেও হবে। আমাদের যেন এ আত্মসচেতনা-টুকু সদাজাগ্রত থাকে যে পররাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে, আমরা যেমন প্রভুর চেয়ে বন্ধুর সন্ধান করবো, তেমনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবরূপায়ণ প্রচেষ্টায় আমাদের সতত এ প্রযত্ন থাকবে: আমরা কারও কোনও অধীনতা স্বীকার না করে এবং দরিদ্র আত্মীয়ে'র মত ভিক্ষার প্রত্যাশী না হয়ে নিজেদের হস্তে নিজেদের প্রতিভানুযায়ী ও মূল্যবোধের অনুসারী আমাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাবো।" এই উক্তিতে লেখক একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পাশ্চাত্য জাতি আজ সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে সর্বগ্রাসীর মত'—এ কথা সত্য নয়। পশ্চিমা সভ্যতায় অনেক আগেই অবক্ষয় সূচিত হয়েছে এবং আজ তা দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে চলেছে। বিগত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বিজয় ঘোষিত হচ্ছে। 'পাশ্চাত্য জগতের বাইরে আত্মরক্ষা করে চলার যোগ্যতা আজ আর কোন জাতির নেই'-এই উক্তি শতাব্দীকাল আগে উচ্চারিত হলে সত্য হত, আজ নয়। আজ আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ আমাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট। যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের অবসান না ঘটে, তাহলে যতই কেননা আমরা 'প্রভু নয় বন্ধু' বলে চীৎকার করি, তাতে আমাদের কোন সংকটই কাটবে না। আর বাইরের পৃথিবীর দিকে না তাকিয়ে আমরা যদি শুধু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকি তাহলে কূপমণ্ডুকতারই পরিচয় দেওয়া হবে। বিদেশের ও বিজাতির অবদানের প্রতি বিরূপতা কেবল অকৃতজ্ঞতা নয় আত্মপ্রবঞ্চনারও নামান্তর। আজকের মানুষের পক্ষে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল ও আত্মধ্বংসী মনোভাব আর কিছুই হতে পারে না।

আজ আমাদের দেশে সংকটের যে ঘনঘটা দেখা দিয়েছে তার হাত থেকে

মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরাসক্ত ও অনাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। দেশীয় যে শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও সহযোগিতার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দু'শ বছর এদেশ শাসন করেছে এবং যাদের প্রাধান্যের অধীনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তেইশ বছর পরেও আজও আমরা সংকটের গভীরে নিমজ্জিত, তার চরিত্র বিশ্লেষণ করা বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের এক অপরিহার্য কর্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক একাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ একটি পূর্বধারণাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে বলে সমস্ত আলোচনা মূল প্রতিপাদ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে লেখক অপরিমেয় পরিশ্রম করেছেন সেকারণে তিনি দেশের যে কোন অধ্যবসায়ী তরুণ গবেষকের আদর্শ। মতদ্বৈধ-সত্বেও পরিশ্রমের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে কারো হাতে আমরা দেশের প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস অবশ্যই পাব। সেই ইতিহাস রচনার পূর্ব-প্রয়াস হিসেবে জনাব আবদুল মওদুদের শ্রম হয়তো কিছুটা সহায়ক হবে। আর লেখকের এ গ্রন্থ একাজে অবতীর্ণ হবার জন্য দেশের অনেক বিদ্বানকে অনুপ্রাণিত করবে। এই বিশ্বাসে এবং সেই সব গ্রন্থের প্রত্যাশায় আমরা প্রতীক্ষারত। অন্তত এজন্য আমরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ।

আবুল কাশেম ফজলুল হক